ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে গ্রাম, বাড়ি, ধনসম্পদ; জীবনহানি ঘটাতে পারে অসংখ্য মানুষের, পশুর, এরকমই এক বন্যায় ঘর ছেড়ে তারিনী তার বৌ সুখীকে নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে পড়ে। প্রচন্ড ঘূর্ণিতে অচেতন সুখী আরো জোরে তারিনীর গলা চেপে ধরে, যন্ত্রনার্ত তারিনী শেষপর্যন্ত বাঁচার দুর্বার আগ্রহে দুহাতে প্রবল আক্রোশে সুখীর গলা টিপে ধরে, ক্রমে সুখীর বিপুল ভারটা খসে যায়, তারিনী জলের ওপর ভেসে ওঠে। ময়ূরাক্ষীর প্রবল বন্যার টানে তারিনী ময়ূরাক্ষীর গভীর-সংলগ্ন হয়ে একসময়ে জৈব আদিম জীবন-প্রেমে জাগতিক মানব-প্রেমকে অস্বীকার করে, 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে এই প্রাণ-বান্তার পরিচয় পাই দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল কালী বাগদীর জীবন রূপায়নে, ভুল করে কালী আখড়াইয়ের ধারে নিজের ছেলে তারাচরণকেই ফাবড়া মেরে খুন করে, তারপর, দেহটা ঐ দীঘিতে পুঁতে দেয়, দীঘির পরিবেশ, কালীবাগদী ও তার ছেলের বৌ-এর চিত্র পরিস্ফুটনে তারাশঙ্কর অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'বেদেনী' গল্পটিতে দেখা যায়, শম্ভু বাজিকর আর তার বৌ রাধিকা কঙ্কালীতলায় প্রতিবছর ভোজবাজি দেখাতে আসে, এইরকমই একবছর তাদের আলাপ হয় কিষ্টো বেদের সঙ্গে। রাধিকা কিষ্টোর দুর্দম সবল চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। গল্পের শেষে সে শম্ভুর তাঁবুর ওপরই কেরোসিন ঢেলে দিয়ে কিষ্টোর সঙ্গে চলতে চলতে খিলখিল করে হেসে বলে — '~~মরুক বুড়া পুড়্যা~~'; 'মরুক বুড়া পুড়্যা' যৌবনের অন্ধ আবেগটাই বড়ো হয়ে উঠেছে এ গল্পে, বেদে জীবনের আরো পরিচয় মেলে তাঁর 'যাদুকরী' গল্পে। বীরভূমের সীথল গ্রামের এই মেয়েরা বিলাসিনী, প্রধান অবলম্বন নাচ-গানের মাধ্যমে ভিক্ষা ও বশীকরণের ওষুধ বিক্রি, এই গল্পের 'যাদুকরী' মেয়েটি একপাড়া থেকে অন্য পাড়ায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, শুধু খেলায় না, পারিবারিক বিরোধেও তার বুদ্ধির যাদুর খেলা দেখায়। অন্ত্যজ-জীবনের চরিত্র রূপায়নে তারাশঙ্কর প্রখর বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবেই।

তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ় বাংলার গ্রাম্য সংস্কার-কুসংস্কারের প্রাত্যহ পাড়ায় ছড়িয়ে আছে। সমস্ত গ্রাম্য সংস্কারের মধ্যেই 'ডাইনী' সম্পর্কিত কুসংস্কারটা পড়েছে। ডাইনীর অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবু এককালে গ্রামীণ মনে ডাইনীতে ছিল দৃঢ় বিশ্বাস, সব থেকে মর্মান্তিক হল, যাকে ডাইনী অপবাদ দেওয়া হচ্ছে সে-ও পারিপার্শ্বের চাপে আস্তে আস্তে একথা বিশ্বাস করতে শুরু করে, তখন তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত জ্বালার অবধি থাকে না, এই মর্মান্তিক দ্বন্দ্বের ও নিদারুণ অন্তর্দাহের চিত্র ফুটে উঠেছে — 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পে। রাধানগরের বেনেদের অসহায় মেয়ে স্বর্ণ হাটে তরিতরকারী বেচে পেট চালায়। সে বাচ্চা টুকুকে ভীষণ-ই স্নেহ করে, কিন্তু এটা টুকুর মায়ের পছন্দ নয়। কারণ স্বর্ণর মা-কে সবাই ডাইনী বলত। মুখুজ্জে বাড়ির গর্ভবতী বৌ অসুস্থ হলে বাড়ির গিন্নী স্বর্ণর নামে

সম্মার্কিত ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে বসে, যুদ্ধে যে মারা গেল, একদিন স্বর্ণ টুকুর জন্যে বাঁশী নিয়ে তাদের বাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়, বাঁশী লুকিয়ে রেখে আসে, পরের দিন দুপুরে স্বর্ণ অদৃষ্টের কথা ভাবছে, এমন সময় টুকু আসে, ~~স্বর্ণ~~ পায়ের শব্দ শুনে তাকে বুকে চেপে ধরার উন্মত্ত অধীর আবেগ জাগলেও অপবাদের কথা ভেবে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। কিছু পরে দরজার ওপাশ থেকে টুকুর বাঁশী বাজানোর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। স্বর্ণের নিখাদ বাৎসল্য ও ডাইনী-বিশ্বাস এ গল্পে মিলেমিশে এক অপূর্ব চমৎকারিত্ব অর্জন করেছে।

'ডাইনী' গল্পের নায়িকা 'সোরধনি' নামে এক বৃদ্ধা, বামনপাড়ার সাহাদের বাগানে চল্লিশ বছর ধরে বাস করছে, পাশেই ভয়াবহ ছাতিফাটার মাঠ। সোরধনিও আজ নিজেকে ডাইনী বলে মনে করে, নিজেকে নিয়ে ভয় পায়। এক যুবতী তার শিশু পুত্রের জন্যে ওর কাছে জল চাইতে গেলে তার লোলুপতার তীব্রতায় সামনে শিশুটি ঘামতে থাকে, তার চোখ লাল হয়ে ওঠে, সোরধনি চীৎকার করে উঠল—'মা মা পালা, ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে' রাস্তে সেখানে হাজির এক বাউরী প্রেমিকা ও তার প্রেমিককে দেখে তার নিজের পুরাতন জীবনের কথা মনে পড়ে যায়, একদিন বাউরী ছেলেটাকে দেখে সে ভাবল, ঐ বাউরী ছেলেটাকে সে খাবে, মনে হতেই সে শিউরে উঠল। ছেলেটাকে ডাকতেই সে প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। সোরধনি চীৎকার করে বলে উঠল, 'মর, মর—তুই মর...।' ছেলেটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে গেল, কিন্তু শেষে তার মৃত্যু হল। লোকে বলল, সোরধনি বান মারাতেই ছেলেটা মারা গেছে। আজ অনেকদিন পরে, তার নিজেরই যৌবনে মৃত স্বামীর জন্যে বুক মাটিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, সেদিন প্রচণ্ড ঝড় উঠল, পরদিন লোকে দেখল, ছাতিফাটার মাঠের ধারে 'খৈরী গুল্মের ভাঙা ডালের সূচালো ডগায় বিঁধে ঝুলছে ডাইনী', এরকম চরিত্র-সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ করতে পারেন নি। চরিত্র ও পরিবেশ এ দু-ই এই গল্পে অনন্যসাধারণ পারস্পারিকতা লাভ করেছে।

(গ.) তারাশঙ্করের গল্পের একটি বিশিষ্ট শাখা—প্রেমের গল্প। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি' প্রেমের গল্প। বৈষ্ণব পুলিন, মঞ্জরী ও গোপিনীকে কেন্দ্র করে স্নিগ্ধ প্রেমের চিত্র রচিত হয়েছে। অল্পবুদ্ধি পুলিনের জীবনে সুখশান্তির কথা ভেবে প্রেমিকা মঞ্জরী সরে আসতে চেয়েছে, নিজ দেহ দান করে জমিদারের ক্রোধ থেকে তাকে বাঁচিয়েছে, তার হয়ে জরিমানা দিয়েছে, শেষে গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হয়েছে। আত্মত্যাগের মধ্যদিয়েই মঞ্জরীর প্রেম বিকশিত, 'বেদেনী' গল্পে শম্ভু, রাধিকা ও কিষ্টোর

জীবনে যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল তাতে প্রেমের দৈবিক আবেগের তীব্রতাই স্পষ্ট হয়েছে। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে সাপ ও নারীর প্রতি যে প্রেম সমর্পিত, তা আমাদের শিহরিত করে, প্রেমের স্নিগ্ধতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় 'তমসা' গল্পে, অন্ধ ছেলে পঙ্খী স্টেশন এলাকায় গান গেয়ে, পশুপাখির ডাক নকল করে ভিক্ষে করে, খেমটা নাচের দলের একটা মেয়ের গান শুনে তার ভালো লাগে, তার মিষ্টি কথায় স্নেহের স্পর্শ পায়। নাচের দলকে অনুসরণ করে পঙ্খী স্টেশন থেকে স্টেশনে যায়, কিন্তু তাদের আর দেখা মেলে না, অনেক বছর পর প্রায় বৃদ্ধ পঙ্খী এক তীর্থক্ষেত্রে মেয়েটির কাছে শেখা গানটি গেয়ে ভিক্ষা করছিল। সেদিন সে এতদিনের খুঁজে ফেরা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। মেয়েটির সঙ্গে থাকা পুরুষটি তাকে একটা আধুলি দিলে ~~পরম কৃতজ্ঞতায়~~ সে আধুলিটি নিল। পঙ্খী পরম কৃতজ্ঞতায় মেয়েটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পঙ্খীর জীবনের এই পরিবর্তন, তা প্রেমের টানে, কিন্তু প্রেমের আলোয় তার জীবনের তমসা কাটল না।

পরকীয়া প্রেমের এই সব গল্পের পাশাপাশি স্বকীয় প্রেমের বেশ কিছু গল্পও আমরা পাই, যদিও তারাশঙ্কর লিখেছেন—'আমার সাহিত্যে নব দম্পতীর বা তরুণ-তরুণীর রাগ-অনুরাগ বিরহ-মিলনের কথা ও চিত্রের অভাব আছে।' (~~কৈশোর স্মৃতি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৪~~) নব দম্পতি বা প্রেমিক-প্রেমিকার রাগ-অনুরাগ বিরহ-মিলনের যে প্রচলিত ধারার অনুবর্তন কল্লোলীয় লেখকদের রচনায় প্রকাশিত হচ্ছিল, তারাশঙ্কর সম্ভবত সেই সব রচনার সঙ্গে নিজের রচনার তুলনা করেই একথা বলতে চেয়েছেন, তিনি চল্লিশের ভিন্নতর পরিবেশে মাটির মানুষের জীবন অঙ্কন করতে চেয়েছেন, প্রেম সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে তার ভিন্নস্বাদ নিয়ে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'মতিলাল' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে, মতিলাল সং সেজে পয়সা রোজগার করে। সে আর তার বৌ ভুবন দুজনেই কুৎসিত, কিন্তু এই কুৎসিত দর্শন তাদের দাম্পত্য-প্রেমে কোনো চিড় ধরতে দেয় নি। তাদের একটাই দুঃখ, তাদের কোনো সন্তান নেই, 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণী ও সুখীর দাম্পত্য প্রেমের নিবিড় চিত্র ফুটে উঠেছে। একটা বউকে নদী থেকে উদ্ধার করার পর সে পুরস্কার হিসাবে চেয়ে নিয়েছে একখানা 'ফাঁদিনত' আর চাদরের বদলে শাড়ি — দুটোই বউয়ের জন্য। এই নিখাদ প্রেমের চিত্র অঙ্কনে আমরা তারাশঙ্করের মধ্যে বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা দেখতে পাই না।

(ঘ.) পশুর সঙ্গে মানুষের প্রেম নিয়ে তারাশঙ্করের দুটি গল্প আছে—'নারী ও নাগিনী' ও 'কালাপাহাড়', এই গল্পদুটি বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'নারী ও নাগিনী' গল্পের নায়ক খোঁড়া শেখ, প্রভাতসূর্যের রক্তাভার মধ্যে সে এক দুর্লভ উদয়নাগ সাপকে দেখতে পেয়ে ধরে আনে, নাকে 'মিনি' পরিয়ে দেয়,